দি ইনিশিয়েটর

আবীর হাসান

এখন আইসিটি নিয়ে সবাই কথা বলছেন। বেশি বলছেন রাজনীতিবিদেরা, ব্যবসায়ীরাও বলছেন। সবাই সবার সাফল্যগাথা তুলে ধরতে আইসিটিকে অন্যতম বিষয় হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন। অথচ এই অবস্থাটি এমনি এমনি আসেনি। এমন নয় যে, সারা বিশ্বে যেভাবে আইসিটি বিবর্তিত হয়েছে, সেই একই গতিতে বাংলাদেশেও আইসিটি বিকশিত হয়েছে। অনেকেই এই বিষয়টিকে এমনভাবে তুলে ধরেন যেনো বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য কিংবা ভারতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়েছে আইসিটিভিত্তিক কার্যক্রম বিকাশে এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারে। মোটেও ওরকম কিছু হয়নি বরং পদে পদে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। আজকে যারা জোরালো দাবি জানান কিংবা ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন, তারাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কতরকম অজুহাত যে তোলা হতো? অটোমেশন হলে চাকরির সুযোগ কমে যাবে, ইন্টারনেটের যোগাযোগ রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবে! যাদেরকে কমপিউটারায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারাই যন্ত্রটাকে বলতেন 'শয়তানের বাক্স'। এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল। কমপিউটার নিয়ে কী বলা উচিত, কোন যুক্তিতে বলা প্রয়োজন, সেই বোধটাও ছিল না অনেকের। অথচ সেই সময় একজন দাঁড়ালেন, বললেন– 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। কমপিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে, ইন্টারনেটের আন্তর্জাতিক সুলভ-সংযোগ নিতে হবে।

বলছি অধ্যাপক আবদুল কাদেরের কথা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, উপলব্ধি করতে না পারার ভয়ে আর কুসংস্কারের মতো বিভিন্ন ভুল বিশ্বাসের কারণে এ দেশে আইসিটি ব্যবহার বাড়বে না। ফলে বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তিন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ। চেতনা ছিল তার শানিত। তিনি সেই আশির দশকের মধ্যভাগ থেকেই মানুষকে বোঝাতে শুরু করেছিলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার ছাড়া এ দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সেই ফোর প্লাস কমপিউটার যখন এসেছিল, তখন থেকেই তিনি নিজে এ প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছিলেন এবং তরুণদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন। তখন তিনি থাকতেন ঢাকার আজিমপুরে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল এই কমপিউটার জগৎ-এর অভিযাত্রা।

এই বিষয়টিকেও অতিসরলভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, ওই সময় বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করাই ছিল যেখানে কষ্টসাধ্য, সেখানে শুধু কমপিউটার বিষয়ে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ উচ্চাভিলাষী শুধু ছিল না, ছিল দুঃসাহসী ব্যাপার। অনেক সাবধান বাণী সত্ত্বেও অধ্যাপক আবদুল কাদের করে দেখিয়েছিলেন, সদিচ্ছা থাকলে লেখক তৈরি করা যায়, কনটেন্ট পাওয়া যায়, বিজ্ঞাপনও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, এই তিনটি সোর্সের সবকটিই তার নিজেকেই তৈরি করতে হয়েছিল। অর্থাৎ লোকজনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে টেনে এনে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডিজিটাল প্রযুক্তির জগতটাকে। মাধ্যমটা বা কেন্দ্রটা কমপিউটার জগৎ। এই মাসিক পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে অনেক লেখক তৈরি হয়েছেন, সম্পাদক-প্রকাশক হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ। ব্যবসায়ী অর্থাৎ আইসিটি পণ্য ও সার্ভিসের বাণিজ্য করতেও উৎসাহী হয়েছেন অনেকে।

অধ্যাপক আবদুল কাদের কি তাহলে আইসিটি আইডিয়ার কারবারি ছিলেন? অনেকেই ভুল করেন। কখনও কারবারটা ঠিকমতো করেননি। করেছেন যেটা, সেটা হলো আইডিয়া শেয়ার করা। দারুণ আত্মবিশ্বাসী এক শিক্ষক ছিলেন তিনি। আর সেই আত্মবিশ্বাসটা ছিল যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক, সেহেতু তিনি নিজে কখনো কোনো দোদুল্যমানতায় ভুগতেন না। কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটি এর প্রমাণ। প্রকাশিত হলো, বিকশিত হলো এবং টিকেও রইল।

অধ্যাপক আবদুল কাদের বাংলাদেশের জন্য আইসিটির আইডিয়াগুলোকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, আইসিটিবিষয়ক কোনো সম্ভাবনা বা কোনো ইস্যুকে পুরনো হতে দেননি। বাঙালিকে ব্যবসায় ধরিয়ে দেয়া বড় সহজ কাজ নয়; অথচ সেই কাজটা অবলীলায় করেছেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। আর একটি বিষয় ছিল– ট্যালেন্ট হান্ট। খুঁজে, খুঁজে মেধাবীদের বের করে আনা। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করা আর বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা সৃষ্টি করার এক অসামান্য ক্ষমতা ছিল তার।

নিজে শিক্ষকতার পেশা থেকে সরকারি কর্মকর্তার পেশায় আসার পর তার কমপিউটারবিষয়ক কর্মযজ্ঞটার পরিধি আরও কার্যকর করে তুলেছিলেন। যতটুকু ক্ষমতা ও সুযোগ ছিল, সবটাই কাজে লাগালেন স্কুল কমপিউটারায়নের জন্য। সরকারি নীতিনির্ধারকেরা তখনও কমপিউটার বিষয়টাই বোঝেন না। শিক্ষার্থীরা কমপিউটার ব্যবহার করে পড়াশোনা করবে কিংবা তাদের পরীক্ষা মূল্যায়ন হবে কমপিউটারের মাধ্যমে– এ ছিল তাদের কাছে ভিনগ্রহের বিষয়। শিক্ষা বোর্ডে কমপিউটারায়নের খবর শুনে ধর্মঘটও হয়েছিল দিনের পর দিন। অধ্যাপক আবদুল কাদের দমেননি। ওই জায়গায় উদ্বুদ্ধকরণের কাজটা তাকে করতে হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে– সরাসরি। পত্রিকা বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না।

ড. মফিজ চৌধুরী স্মৃতি ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সাথে অধ্যাপক আবদুল কাদের (সর্ব বাঁয়ে)

সমস্যা সমাধান করার ধৈর্য্য ও কৌশল তাকে মহিমান্বিত করেছিল। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা মাত্র রইলেন না, হয়ে উঠলেন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব। ওজনহীন কথা বলেন না, বাস্তবসম্মত না হলে কোনো আইডিয়া নিয়ে কাজ করেন না– এ দুটো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল অচিরেই। ফলে স্কুল কমপিউটারায়নের প্রস্তাবনা যখন তার বিভাগ থেকে দেয়া হলো, তখন তাকে উচ্চাভিলাষী ভাষা হলেও একেবারে অবমূল্যায়ন করতে পারেননি উচ্চতর স্তরের কর্মকর্তা ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা।

একদিকে যখন তৎকালীন সরকারকে কমপিউটারবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্বমতে আনার কাজটি করেছিলেন, পাশাপাশি তখন কমপিউটার জগৎ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কমপিউটারকে পরিচিত করে তোলার কাজ হাতে নিয়েছিলেন। হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে কমপিউটার নিয়ে চলে যেতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এটা শুধু শিক্ষার্থীদের বিষয় ছিল না– সাধারণ মানুষ, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী– সবাই যাতে কমপিউটারের কার্যকারিতা বুঝতে পারে, সে বিষয়টিই ছিল মুখ্য। সে সময়ই বেশি টেলিমেডিসিন, কৃষিতথ্য সহায়ক কমপিউটার ব্যবহার এবং গ্রামীণ জীবন উন্নয়নে তথ্য ব্যবহারবিষয়ক নানা আইডিয়া নিয়ে কাজ করেছেন। নিজের এবং পরিচিতজনদের যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জেলার কয়েকশ' গ্রামে তো নিজেই গেছেন। এছাড়া অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন মফস্বল শহর বা গ্রামে গিয়ে কমপিউটার নিয়ে কথা বলার ব্যাপারে। বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে এসব কাজ হয়েছিল কোনো ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই। কোনো এনজিও বা সংগঠনও কিছু করেনি। একজন ব্যক্তি– অধ্যাপক আবদুল কাদের ছিলেন এর পেছনে।

এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার ঘটনা বিরল বটে, তবে অধ্যাপক ▸